Shooting Pal

বুদ্ধদেব গুহ

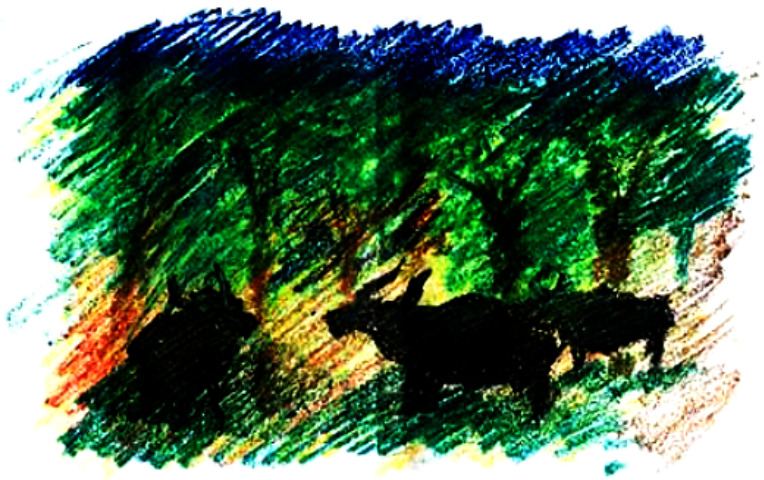

যে সময়ে শিকার করা বেআইনি ছিল না এবং শিকার ছিলও প্রচুর সেই সময় আমার shooting Pal-এর একজন ছিল অলীক রায়।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড-এর দোভি থেকে ডানদিকে যে পথটি হারিয়ে গেছে তা গেছে বিহারের গেয়া জেলায় আর বাঁদিকে যে পথ গেছে তা গেছে জৌরি হয়ে গতরা। এই পথেই দোভি থেকে দশ মাইলের মধ্যে একটি পথ ডাইনে চলে গেছে পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে হান্টারগঞ্জে। একসময়ে শিকারের খুব বিখ্যাত জায়গা ছিল।

কে এই হান্টার, যাঁর নামে গঞ্জ, তা জানা নেই। তৎকালীন বিহার অধুনা ঝাড়খন্ডে এবং ভারতের নানা জায়গাতে এখন নানা গঞ্জ ছিল। কোনও না কোনও সাহেব এই সব গঞ্জ-এর প্রতিষ্ঠাতা। ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, হান্টারগঞ্জ, ডালটনগঞ্জ, হ্যামিলটনগঞ্জ ইত্যাদি।

এক ডিসেম্বরের রাতে আমি আর আমার বন্ধু অলীক রায় গয়াতে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে জিপে করে হান্টারগঞ্জ-এ গিয়ে পৌঁছই। ওদের বাড়িটা ঠিক গয়া শহরে ছিল না। শহরের অনেক বাইরে নিরিবিলি জায়গাতে, ফল্গু নদীর প্রায় উপরে। বিরাট বাগানওয়ালা বাংলো বাড়ি। অলীকের বাবা ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের নামী ব্যারিস্টার। শখ করে বাড়ি বানিয়েছিলেন কিন্তু নিজে আসার সময় পেতেন না। কখনও-সখনও আসতেন অলীকের মাকে সঙ্গে নিয়ে বিরাট ওলডসমোবাইল গাড়ি নিয়ে।

ওদের বাড়ির নাম ছিল 'The Retreat'। যেমন অনেক শৌখিন বাঙালির কলকাতার বাইরের বাড়ির নামই হত তখনকার দিনে। মালি, দারোয়ান, বাবুর্চি, একটি ব্যক্তিগত (?) স্টেশন ওয়াগন গাড়ি, আর্মি ডিসপোজাল থেকে কেনা একটি জিপ এবং ড্রাইভার সব সময় বাড়িতেই থাকত। আমরা ওখানে নামলেই স্টেশনে গাড়ি নিয়ে হাজির থাকত এনায়েৎ, অনীকদের ড্রাইভার।

অনীক আর আমি দুজনেই তখন আইন পড়ি। অনীক তো ব্যারিস্টারি পড়বেই, স্বাভাবিক। আমার পড়া হয়তো হবে না। পারিবারিক ব্যবসাতে ঢুকতে হবে। আমি বড় ছেলে। সবটা ধারা মতে একটা বড় ছেলে হয়। আমার নিজস্ব মতামতের কোনও দাম ছিল না।

এত কথা কেন বলতে বসলাম জানি না। আমি জীবনের শেষবেলাতে। আমার বন্ধু অনীক আজ প্রায় পনেরো বছর হল চলে গেছে। ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেছিল বটে কিন্তু ওর মন ছিল না তাতে। অনেক পৈতৃক সম্পত্তি থাকলে সম্ভবত বাঙালি ছেলেদের মধ্যে কমই পরিশ্রম করতে চায়। অথচ অবাঙালিদের বেলাতে তা হয় না। আমি কিন্তু ব্যবসাতে যোগ দিয়ে রীতিমত পরিশ্রম করতাম। যদিও অনীকের বাবার মতো নন তবু বাজারে আমার বাবাও বড়লোক বলে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু আমি কখনওই অন্য পাঁচজন বড়লোকের ছেলের মতো ছিলাম না। অনীক প্রায়ই তাদের The Retreat-এ চলে আসত। হাজারিবাগ, চাতরা, হাজারিবাগ, পালামৌ, বারোয়াডি, সিমডেগা, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ, বাড়ি, হাজারিবাগের মধ্যে কোটিপাহাড়, পেটারবার-পিপরা, মুনুরবেড়া ইত্যাদি জায়গাতে শিকার করে বেড়াত।

মাঝে মাঝেই আমাকে ট্রাঙ্ক কল করত, হাজারিবাগে ম্যানইটার লেপার্ড বেরিয়েছে, আমি এসেছি, তুমি চলে এসো। কখনও বলত, চাতরার কাছে বাড়ওয়ার জঙ্গলে বাঘ দেখা গেছে। তুমি কালকে এসে থাকতে পারবে কি? চলে এসো। অথচ আমার তখনকার কাজে তখন আমি ন্যাজে-গোবরে হয়েছিলাম। কনস্ট্রাকশনের কাজ। নানা জায়গাতে যেতে হয়। নানা জায়গাতে কাজ চলছে। আমি নিজে ইঞ্জিনিয়ার নই অথচ অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে কাজ করতে হয়, নতুনদের এবং অনেক ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়েও।

এত সব কথা এলোমেলো মনে আসছে যে কোনটা আগে কিংবা কোনটা পরে তা বুঝতে পারছি না। অনেকক্ষণ একা থাকলেই এখন অনীকের গলা শুনি। শুনি, কী করছ? আছো কেমন? যেন সে আমার ঘরের দরজাতে দাঁড়িয়ে বলে।

একেবারে চমকে উঠি। কিন্তু ভয় হয় না। ছেলেবেলার সহপাঠী এবং শিকারের বন্ধু অনীক, তাকে খুবই মিস করি। আমার কাজের জগৎ আলাদা ছিল যতই বলো তা কখনওই মানতে পারিনি। দু-তিনজন শিকারের বন্ধুই আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। তাই তারা চলে গিয়ে বড় একা করে দিয়ে গেছে আমাকে।

অনীকের শিকারে উৎসাহ ছিল প্রবল কিন্তু গুলি করার সময়ে বড় তাড়াহুড়ো করত, ফলে ওর গুলি প্রায়ই মিস হত। শিকারের ধৈর্য এবং ঠান্ডা মাথা সবচেয়ে বেশি দরকার -- বিশেষ করে বিপজ্জনক শিকারে। বিপজ্জনক বড় জানোয়ার দেখে হয়তো একটু নার্ভাসও হত। সে সব শিকারে ট্রিগার টানবার আগে অনেক ব্যাপারে চিন্তা করে তারপর টানতে হয়। গুলি ছোঁড়া কথারই মতো ছুঁড়ে দেওয়া গুলিও আর ফেরানো যায় না।

আমিও নানা জায়গাতে শিকার করতে যেতাম। যেখানে যেখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ হতো সে নদীর উপরে ব্রিজই

হোক কী জঙ্গলের মধ্যে টাউনশিপ, তার আশেপাশে বিগ-গেম ও ফেদার-গেম-এর বন্দোবস্ত করত আমার কোম্পানির ছেলেরা। ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে রচপাল সিং নামের একটি সর্দার ছেলে ছিল। সে ভারি উৎসাহী আর ভাল শিকারী ছিল। সেও মারা গেছিল মাত্র পয়তাল্লিশ বছরে ভিলাই-এর কাছে এক জিপ দুর্ঘটনায়। এই বয়সে পৌঁছে, এখন বেঁচে থাকাটাই একটা দুর্ঘটনা বলে মনে হয় আর মৃত্যুটাই নিয়ম।

হান্টারগঞ্জে এক ডিসেম্বরের রাতে শিকারে গিয়ে একদল শম্বরের মধ্যে পড়ে অলীক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। ওর উত্তেজনা, ড্রাইভার এনায়েৎ-এর মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। শম্বরগুলো একটি মস্ত কুলথি ক্ষেতের মধ্যে কুলথি খাচ্ছিল গলা উঁচিয়ে। কলাই ডালকে বিহারে, ঝাড়খন্ডে 'কুলথি' বলে। শম্বর হরিণরা খেতে খুব ভালবাসে। এনায়েৎ উত্তেজিত হয়ে বাঁশের বেড়া ভেঙে জিপ নিয়ে আরও এগোতে যেতেই একটি বড় গাড্ডাতে পড়ে গেল জিপ। জিপের ব্যাটারি থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নিকষ অন্ধকারে আমরা কয়েক মুহূর্ত বসে রইলাম। নিজের থেকেই আবার হেডলাইট জ্বলে উঠল -- দেখলাম আমরা শম্বরের দলটার একেবারে মধ্যে রয়েছি। ওরাও আমাদেরই মতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে শম্বরই শম্বর।

আমি ফিসফিস করে বললাম, বড় শিঙল দেখে মারো। আমরা তখন দুজনেই ছাত্র -- দুজনের হাতেই দোনলা বন্দুক। অনীককে মারতে না দিয়ে আমি আগে মারলে অনীক মনক্ষুন্ন হতো, পরিস্কার বুঝতে পারলাম, কিন্তু মুখে কিছু বলত না। সে কারণেই আমি ট্রিগার গার্ড ও আঙুল ছুঁইয়ে রাখা সত্ত্বেও ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়ালাম না। কলেজের ছাত্র থাকাকালীন এন সি সি-র নানা প্রতিযোগিতাতে র‍্যাপিড শুটিং আমি খুব ভাল করতাম তাই খুব তাড়াতাড়ি মারতে পারতাম বন্দুক তুলেই এবং নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই আমার গুলি লক্ষ্যভেদও করত। কিন্তু অনীক অধিকাংশ গুলিই মিস করত। ওর চশমাও আর একটা কারণ ছিল। রাতের বেলায় চশমার কাচে আলো পড়ে ধন্দে ফেলে বন্দুকচালককে। কিন্তু তার চেয়েও বড় বাধা ছিল ওর টেম্পারমেন্ট। অযথা এক্সাইটেড হয়ে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে ও ট্রিগার টানত আর গুলি মিস করত। এটা কিন্তু হত শুধুমাত্র রাতের বেলাতে এবং বিগ গেম-এর বেলাতেই। ও স্কিট ও ট্র্যাপ শুটিংও করত গান ক্লাবে। দুর্দান্ত ফ্লাইং মারত। কোনও বিটিং-এ কোনও পাখি উড়লে তার আর প্রাণ নিয়ে ফেরার উপায়ই ছিল না অনীক রায়ের হাতে বন্দুক থাকলে।

যা হওয়ার তাই হল। আক্ষরিকার্থে শম্বরদের মধ্যে বসে থেকেও অনীকের গুলি কোনও শম্বরেরই কেশাগ্র স্পর্শ করল না। তারা হুড়দৌড় করে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ইচ্ছে করেই গুলি করলাম না। আমার গুলিতে যদি পড়ত, গুলি করলে পড়তই, তা হলেও অনীক অপ্রসন্ন হত।

এই সব ছোটখাটো মাৎসর্য ও ঈর্ষার কথা প্রত্যেক খেলোয়ার, মাছ ধরিয়ে ও শিকারী মাত্রই জানেন। জীবনের কর্মক্ষেত্রে এ সব তো থাকেই। অত্যন্ত বেশি মাত্রাতেই থাকে। কিন্তু এই সব স্পোর্টস-এর ক্ষেত্রেও যে থাকে সেটা দু:খজনক। প্রকৃত স্পোর্টসম্যান স্পোর্টস-এর জগতেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমি তো ওর অতিথি হয়েই শিকারে যেতাম তখন, ওদের বাড়িতেই উঠতাম। তাই ওর কথা আমাকে ভাবতে হত। ও দু:খ পায় এমন কিছুই করতে চাইতাম না।

রাঁচির বাড়িতে থেকে শিকার করা আমার মা একেবারেই পছন্দ করতেন না। বাবার শিকারের সখ ছিল না। মা বলতেন, রক্তমাখা নিরীহ প্রাণীদের মেরে আমার বাড়িতে আনতে পারবে তো। তাই অনীককে আমি রাঁচিতে নেমন্তন্ন করতে

পারতাম না। তবে কাজ যোগ দেওয়ার পর আমি যখন বাইরের সাইটে থাকতাম তখন অনীককে আসতে বলতাম কিন্তু বেশি নড়াচড়া ওর ধাতে ছিল না ছেলেবেলা থেকেই। ভীষণই আরামী আর ঢিলে মানুষ ছিল সে। তার অনেক গুণ ছিল, রসিক, সঙ্গীত ও ছবিপ্রেমী, সাহিত্যপ্রেমী, কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে ও হীনম্মন্যতাতে ভুগত। ওকে ভালবাসতাম বলে আমি ওর এই খামতি সহ্য করে নিতাম।

এই হড় বড় করার জন্যেই ও বড় শিকার প্রায় করতেই পারত না। আমি যখন বাঘ, ভাল্লুক, লেপার্ড, বাইসনও মেরেছি, বিভিন্ন রকমের হরিণের কথা বাদই দিলাম, ট্রফি বলতে তখনও অনীকের কিছুমাত্রই হয়নি। এই নিয়েও ওর হীনম্মন্যতা ছিল।

ছাত্রাবস্থাতেই ওল্ড চাতরা রোডে ঠিক সন্ধের পরে পরেই পথের বাঁ পাশে এক গ্রীষ্মরাতে একটি বিরাট লেপার্ড, প্রায় বড় বাঘের মতো, ব্রডসাইড দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জিপ থেকে দশ গজের মধ্যে। তার কিছুদিন আগেই আমি ঝুমরি তিলাইয়ার কাছে শিবসাগরের জঙ্গলে একটি চিতা মেরেছি। সেবারেও আমি ট্রিগার গার্ড ও আঙুল ছুইয়ে রেখে অনীককে বললাল, চাপা গলায়, মারো অনীক, এমন সুযোগ পাবে না। অনীক অনেক সময় নিল বন্ধুক তুলতে, তারপর গুলি যখন করল তখন তা লাগল গিয়ে চিতার পেটে। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠল চিতা একলাফে অনেকখানি উপরে তারপর বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মাটিতে পরে অন্ধকার জঙ্গলে অন্তর্ধান করল। পেটে গুলি লাগা বাঘ বা চিতার মতো বিপজ্জনক জানোয়ার আর হয় না। ছেলেমানুষ এবং আত্মঘাতী হঠকারিতায় আমরা ওই অতবড় আহত চিতার খোঁজে এক হাতে টর্চ আর অন্য হাতে বন্দুক নিয়ে অন্ধকার রাতে জঙ্গলে নেমে গেলাম। তাকে সাহস বলে না, মুর্খামি বলে। সে যাত্রা অঘটন ঘটেনি, আমরা যে প্রাণ নিয়ে বাড়িতে ফিরেছিলাম সে জন্যে মায়েদের আশীর্বাদই কাজ করেছিল নিশ্চয়ই।

পরবর্তী জীবনে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে আমি একটি মস্ত বড় বাইসন, মানে গাঙর শিকার করলাম। তার শিং দুটি ছিল দেখবার মতো। মাদ্রাসের ভ্যান ইনজেন অ্যান্ড ভ্যান ইনজেন ট্যাক্সিডারমিস্ট-এর দোকান থেকে সেই গলা শুদ্ধ সিং মাউন্ট করে আমাদের বাড়ির রিসেপশন লবিতে লাগালাম। 'বৃষস্কন্ধ' শব্দটি সকলেরই জানা কিন্তু বাইসনের ঘাড় যাঁরা কাছ থেকে না দেখেছেন তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না সেই স্কন্ধর রকমটা। অনীক একদিন রাঁচিতে এসে আমার বাইসন দেখে গেল।

আমি আমার কাজ নিয়ে পাগলের মতো ব্যস্ত। অনীকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন না হলেও আলগা হয়ে এসেছে। দেখাও খুবই কম হয়। আমাদের পাটনার বাড়ি থেকে মাঝেমধ্যে ওকে ফোন করি। অন্য জায়গা থেকেও করি। ও বলে, কালই The Retreat-এ যাচ্ছি। তিলাইয়ার হ্রদে একটা আর গুজ এসেছে। চলে এসো।

-- এত শর্ট নোটিসে কি যাওয়া যায় ?

-- তুমি টাকা চিনেছ ? টাকাই রোজগার করো।

ওকে কী করে বোঝাব যে ব্যবসাটা পারিবারিক। খাটনিটা, দায়িত্বটা অনেক, কিন্তু আমার খাটনির সঙ্গে অর্থোপার্জনের কোনও সাযুজ্য নেই।

বললেও ও বুঝত না। এই সংসারে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মানসিকতা দিয়েই অন্যকে বিচার করে। তাদের সাধ্যই নেই অন্যর মানসিকতা বোঝে। তাই ছেলেবেলার, কৈশোরের, যৌবনের প্রগাঢ় বন্ধুত্বও কেমন ছেঁড়া ছেঁড়া ছাড়া ছাড়া হয়ে যায়। পুরোপুরি একইরকম মানসিকতার মানুষ বিধাতা বোধহয় দুটি সৃষ্টি করেননি। এ সব তাঁরই চক্রান্ত।

শুনতে পাই অনীক এখন অধিকাংশ সময় The Retreat-এই থাকে। কাজে ও একেবারেই সিরিয়াস নয়। মেসোমশায়ের ব্যারিস্টার হিসাবে যেমন নামডাক ছিল সে তুলনায় ওএর কিছুই হল না। আমাদের বয়সও পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ওর দু-তিনজন জুনিয়র আছে। সেরেস্তা তাদেরই উপরে। এবং অনীকের চারিত্রিক কারণে ও তেমন কৃতি কারোকে জুনিয়র নেয়ওনি। ওর চরিত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ করতাম ছেলেবেলা থেকেই। ও নিজের চেয়ে উৎকৃষ্ট কারো সঙ্গে সংসর্গ করতে পারত না। সবসময়ই ওর চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষদের সঙ্গে ওঠা-বসা, বন্ধুত্ব করত। কিছু নির্গুণ মোসাহেব পরিবেষ্টিত থাকতে ভালবাসত।

এর-তার মুখে খবর পেতাম যে ওর শরীর ভাল যাচ্ছে না। ও হাইলি ডায়াবেটিক ছিল। একদিন অফিসের মধ্যেই সেরিব্রাল ও হার্ট স্ট্রোক হল। কিন্তু তারপরেও ও ডাক্তারদের বারণ না শুনে আবার The Retreat-এই গিয়ে রইল। একটা বাঁচোয়া এই যে, ও বিয়ে করেনি। বিয়ে করেনি বলে ও বিবাহিতদের নানা অসুবিধা সম্বন্ধেও অজ্ঞ অথবা অন্ধ ছিল।

এই সময়ে একদিন খবর দিল অনীক যে তাদের পাটনার বাড়িতে আসতে হবে একবার। সিংভূমের সারান্ডার জঙ্গলে সে এক প্রকান্ড বাইসন শিকার করেছিল চারমাস আগে। কলকাতার কার্থবাইসন হান্টারকে দিয়ে মাউন্ট করেছে সেটি। আমাকে আসতেই হবে। মাসকয়েক আগে ও জৌরীর কাছে, যেখানে ফল্গুর উপশাখা উলাজান আর জাঁম নদী বয়ে গেছে সেখানে মাচাতে বসে একটি মস্ত লেপার্ডও শিকার করেছিল। সেই উপলক্ষ্যে ও একটি ককটেইল অ্যান্ড ডিনারের বন্দোবস্ত করেছে। পাটনার অনেক মান্যগণ্য মানুষ আসবেন কিন্তু ও বলল, আমি না থাকলে সেই পার্টিই বেকার হয়ে যাবে।

আমি তখন মধ্যপ্রদেশের শিংগ্রোলিতে, নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। যাই হোক গেলাম সব কাজ ফেলে পাটনাতে। অনীককে অত খুশি আর কখনওই দেখিনি। কিন্তু ওকে দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। চেহারা দেখেই বুঝলাম ও আর বেশিদিন নেই। তাছাড়া হাইলি ডায়াবেটিক হয়েও ড্রিঙ্কও করছে খুব। ব্যারিস্টার বাবার গুণ না পেলেও দোষটি পুরোপুরি পেয়েছে। ততদিন মেসোমশায় মাসিমা তাঁদের একমাত্র সন্তানকে রেখে পরপারে চলে গেছেন।

অনীকের ককটেইল পার্টির মাস দুয়েক পড়ে বড়জামদাতে গেছিলাম একটি কাজে। সেখানে বিষ্টুবাবুর সঙ্গে দেখা। বিষ্টু দত্ত। ওই অঞ্চলের নামকরা শিকারী। একসময়ে ভয়াবহ পোচার হিসাবেও কুখ্যাতি ছিল। এদিকে সারান্ডা ওদিকে বলরামপুর থেকে তুলিন সব জায়গার মানুষই তাঁকে চিনত এক ডাকে। আর চিনতেন বনবিভাগের মানুষেরা। ভয় ও ঘৃণা মিশ্রিত অনুভূতি ছিল তাঁদের কারণ বিষ্টুদা করতে পারতেন না এমন কাজ নেই। আমাকে তিনি বহুদিন থেকেই চিনতেন।

বড়বিল-এর মিত্র এস কে প্রাইভেট লিমিটেড-এর গেস্ট হাউসে উঠেছিলাম। সেখানে বিষ্টুদা দেখা করতে এলেন। এ কথা সে কথার পরে বললেন, তোমার ব্যারিস্টার বন্ধু অনীক এসেছিলেন। পাটনার নামী ব্যারিস্টার গদা রায়ের ব্যাটা।

খুব করে ধরলেন একটা বাইসন মারিয়ে দেওয়ার জন্যে। তো নিয়ে গেলাম মনোহরপুরে। ভিড়িয়ে দিলাম পুরো দলের মধ্যে। কী বলব তোমাকে, এমনই নার্ভাস যে গুলিই করতে পারেন না। ভয় হল আমাদের Gore করে না দেয়। যারা শিং-এর এক ধাক্কাতে মাসিডিক ট্রাক উল্টে দেয় তাদের কাছে আমরা কি ?

তারপর ?

শেষমেষ গুলি করলেন রাইফেল দিয়ে। এত ড্রিঙ্ক করেন যে হাত কাঁপে। পড়ে গেল একটা বাচ্চা। ছিঃ ছিঃ। এদিকে বাইসনের দল আমাদের চার্জ না করে পালিয়ে যাচ্ছিল। একটা বড় বুলকে মারলাম আমি পাশ থেকে -- একেবারে Nape of the neck-এ। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের মতো বাইসনটা পড়ে গেল।

তারপর ?

তারপর আর কি। সেই বাইসনের গলা থেকে ফেটে মাংস স্তূপ করে বের করে দিয়েছিলাম তোমার বন্ধুকে। খুবই খুশি তিনি। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে হারবার্টসন হার্পারও দেবেন বলে। এক্কেবারে ডরপোক। বুঝলেন কিনা। এঁরা শিকার করতে আসেন কেন। বড়টা না হয় ট্রফি হবে -- বাচ্চাটা ? হায়না শকুনের খাদ্য হবে মিছিমিছি।

তার মাসখানেক বাদে খবর পেলাম অনীক নার্সিংহোমে। আবার স্ট্রোক হয়েছে। পাটনার নার্সিংহোম-এ মুনলাইট আছে। বোধহয় বাঁচবে না। আমাকে দেখতে চেয়েছে।

আমি তখন সম্বলপুরে। সে রাতেই ট্রেন ধরে পাটনা গেলাম। ভিজিটিং আওয়ারে গেলাম ওকে দেখতে। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। ওর খাটের পাশের চেয়ারে বসে বললাম, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ -- আবার আগেকার মতো শিকারে যাব। ভাল তোকে হতেই হবে। For old times sake

ও বলল, আর হবে না যাওয়া, আমি আর ভাল হব না। বলল, বড়জামদার বিষ্টু দত্ত এসেছিলেন পড়শু আমাকে দেখতে।

তাই ?

হ্যাঁ। বললেন, তোর সঙ্গেও নাকি দেখা হয়েছিল বড়বিল-এ কয়েক মাস আগে। তুই তো বলিসনি।

হ্যাঁ। হয়েছিল। বলার সুযোগ পেলাম কোথায় ?

কী কথা হল ? তোর সঙ্গে ?

অনীক আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল।

-- তোর খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, এই বয়সে ওর সবসময়ে ড্রিঙ্ক করা সত্ত্বেও এমন হাত দেখা যায় না। বিরাট

বাইসনটাকে একটা অ্যাংগুলার শটে এক গুলিতে ধরাশায়ী করতে আমি খুব কম শিকারীকেই দেখেছি। এরকম স্পেকটাকুলার শট।

-- আমি সেই প্রথম যৌবনে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার স্কটসম্যান গ্রেগরী সাহেবকে করতে দেখেছিলাম -- এই রকম ছবির মতো মার মারতে আর দেখলাম তোমার বন্ধুকে।

-- অনীক অনেকক্ষণ আমার দু'চোখে চেয়ে রইল।

-- বলল, তুই কি বললি ?

-- আমি কী বলব। বললাম, আপনি অনীকের ফ্লাইং শট যদি দেখতেন বিষ্টুদা। যোধপুর আর জয়পুরের মহারাজরা একবার ওলিম্পিক ট্রায়ালে ওর মার দেখে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

তোর মনে আছে এখনও ? তুই তো সেবারে ছিলি দিল্লিতে থাকবে না ?

বিষ্টুদা কি বললেন ?

বললেন, তাই বলুন !

অনীকের দু'চোখের কোণা দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

অনীক বলল, তুই আমার খুব ভাল বন্ধুরে।

আমিও বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললা,, তুইও আমার। তাড়াতাড়ি ভাল হ। এবার সত্যিই যাব তোর সঙ্গে The Retreat-এ।

অনীক খুব ক্ষীণ সুরে থেমে থেমে বলল, যাব রে যাব, The Retreat-এ।

.....